প্রথম

উমেশ শর্মা

এদিকে একবার আয় তো।

আগডুম বাগডুম খেলা ছেড়ে বাবার কাছে আসতেই হল। রাশভারী বাবা কোনওদিন তো এমন আদর করে কাছে ডাকেননি। ধমক ধামক খেতেই তো অভ্যস্ত ছিলাম। আজ জন্মদিন। তাই আদুরে ডাকটাই মিষ্টি। ঠাকুরঘরে বাবা আমাকে কোলে বসালেন। পাশে নতুন স্লেট, চক, শিশুশিক্ষার বই। বাবা বললেন, আজ তোর 'হাতে খড়ি' দেব।

'হাতে খড়ি' ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না। আমার হাতে খড়ি দেবেন কেন? খড়ি তো বোধহয় রান্নার কাজে লাগে। মা শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের হাতে খড়ি দিলেই তো হয়।

বাবা আমার থতমত খাওয়াটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। 'বললেন, আয়, তোকে আজ অ, আ লেখা শেখাব। এই খড়ি পেন্সিলটা ধরে বই দেখে দেখে এই স্লেটে লিখবি। এটাকেই 'হাতে খড়ি' দেওয়া বলে। বুঝেছিস?' এ কথা বলে শিশুশিক্ষা বইটির পাতা মেলে ধরলেন। তারপর হাতে খড়িটি ধরালেন। বাবার বড় মুঠোর মধ্যে খড়ি ধরা আমার ছোট হাত। আমি লিখলাম অ–আ–ই–ঈ। আসলে বাবাই লিখলেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। তারপর কোল থেকে নামিয়ে ওই লেখাগুলোর উপর খড়ি দিয়ে হাত ঘোরাতে বললেন।

এতদিন দিব্যি খেলাধূলা আর দস্যিপনা করেই আমার দিন কাটছিল। 'হাতে খড়ি' পর্বটার পর সেই ছন্দটা একটু একটু করে বদলাতে থাকল। দুষ্টুমি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই মা ধমকান। ধমকানিতেই শেষ নয়, স্লেট আর খড়ি বার করে মা বসিয়ে দিতেন দাগা বুলোতে। বাংলা ১, ২, ৩ লিখতেও শিখে গেলাম। কাজ থেকে ফিরে বাবা দেখি মায়ের কাছে খোঁজ নেন, 'হ্যাঁগো ছেলেটা হাতের লেখা করছে তো? এবার তো ওকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে।'

স্লেটে সব সময় যে অ–আ–র উপর দাগা বোলাতাম তা নয়, বিচিত্র আকারের সব জীবজন্তুর ছবিও আঁকতাম। ভোরের সূর্য, পাখি, নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকা — এ সবও আঁকতাম। অক্ষর পরিচয়টা ভাল করে হয়ে যাওয়ার পর একটু একটু করে ধরে গেল বই পড়ার নেশাও।

মাকেও দেখেছি পিওনকাকুকে বিজয়ার পর এলে মিষ্টি খাওয়াতে। পিওনকাকুর কাঁধে ঝুলত বড় একটা ঝোলা। তার মধ্যে থাকত একটা জাবেদা খাতা। বাড়িতে চিঠি বা কোনও কাগজের প্যাকেট এলে দেখতাম পিওনকাকুর সেই জাবেদা খাতার রুলটানা পৃষ্ঠায় বাবা লিখতেন নিজের নাম, ঠিকানা, তারিখ। পরে বুঝেছিলাম, ডাকপিওন যে প্রতি সপ্তাহে এ গ্রামে চিঠি বিলি করতে আসে, এটা তারই প্রমাণচিহ্ন হিসাবে গণ্য হয়।

তো আমার খুব রাগ হত। বাবার নামে নিয়মিত এত এত চিঠি আসে, কিন্তু আমি কি বাড়ির কেউ নই! কেউ আমাকে চিঠি লেখে না কেন? বিজয়ার চিঠি হিসাবে পাঠানো বড়দের চিঠিতে বড়জোর লেখা থাকে, 'নাতিকে আশীর্বাদ'। কেন, আমি এখন রীতিমতো ক্লাস ফাইভের ছাত্র। অনেক বড় হয়ে গিয়েছি। আমায় কি আলাদা করে চিঠি লেখা যায় না! আমি কি এতই তুচ্ছ! দুঃখের এ কথা মাকে বললাম। মা পাত্তাই দিলেন না।

একদিন ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা ফন্দি এল। মনে পড়ল, আমার কলেজে পড়া মামা তো হস্টেলে থাকে। মামাকে চিঠি লিখলে কেমন হয়! আমি তার প্রিয় ভাগনে। ভাগনের চিঠি পেলে মামা জবাব দেবে নিশ্চয়ই। ব্যস, তাহলেই তো আমার ইচ্ছাপূরণ ঘটবে। এই বুদ্ধিটা আগে যে কেন মাথায় আসেনি।

উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসছে না। জেগেজেগেই স্বপ্ন দেখছি। ডাকপিওনকাকু বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করছেন। আমি যেতেই আমার হাতে তুলে দিলেন আমাকে লেখা মামার চিঠি। ওঃ! আমার নামে আসা প্রথম চিঠি। নাঃ! সত্যিই এবার বড় হয়ে গেলাম তা হলে।

শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না। বাবার কাগজপত্র হাটকে বার করলাম মামার হস্টেলের ঠিকানা। মাকে ভজিয়ে আদায় করলাম একটা সিকি। তারপর ডাকঘরে গিয়ে কিনে আনলাম একটা ইনল্যান্ড লেটার। চিঠি লিখলাম মামাকে। জিগাগাছের আঠা দিয়ে মুখবন্ধ করলাম চিঠিটার। তারপর স্কুল যাওয়ার পথে বেলাকোবা ডাকঘরে গিয়ে লাল ডাকবাক্সে

উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসছে না। জেগেজেগেই স্বপ্ন দেখছি। ডাকপিওনকাকু বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করছেন। আমি যেতেই আমার হাতে তুলে দিলেন আমাকে লেখা মামার চিঠি

তারপর একদিন ভর্তি হয়ে গেলাম ইস্কুলে। প্রথম প্রথম একটু ভয় ভয় ভাব ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইস্কুলে জুটে গেল অনেক নতুন বন্ধু। ব্যস, ভয় উধাও। পড়াশোনার পাশাপাশি সমান তালে চলতে থাকল দস্যিপনাও। দেখতে দেখতে ক্লাস ফোর। তারপর বৃত্তি পেয়ে প্রাইমারি স্তর ডিঙিয়ে গেলাম একদিন। ভর্তি হলাম হাইস্কুলে। ক্লাস ফাইভ। মনে তখন ভাব, বিরাট বড় হয়ে গিয়েছি। এই ক্লাস ফাইভে ওঠার পরই ঘটল একটা কাণ্ড। এবার সে কথাটাই বলা যাক।

চলতি দুনিয়ায় স্মার্ট ফোন, হোয়াটস্ অ্যাপ, ফেসবুকে অভ্যস্ত প্রজন্ম ধারণাই করতে পারবে না তিন–চার–দশক আগে চিঠিপত্রের কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধু চিঠিপত্র নয়, আসত নানা পত্রপত্রিকাও। মফস্সল শহরে খাকি পোশাক পরা পিওন সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে চিঠি বিলি করছে — এটা ছিল খুবই পরিচিত দৃশ্য। আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে নিয়মিত নানারকম চিঠিপত্র আসত, কখনও খামে, কখনও নীল রঙা ইনল্যান্ড লেটারে বা কখনও পোস্টকার্ডে। ডাকপিওন আমাদের এত পরিচিত ছিলেন যে তাঁকে পিওনকাকু বলে ডাকতাম আমরা। বিজয়ার পর চিঠি আসার ধুম পড়ে যেত।

ফেললাম সেই চিঠি। গোটা কাজটাই একেবারে গোপনে সারতে পেরেছি বলে বেশ আত্মতৃপ্তিও হচ্ছিল। এবার শুরু হল মামার চিঠির জন্য অধীর প্রতীক্ষা।

একদিন যায়, দু'দিন যায় — আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার মুখে। তারপর হঠাৎই একদিন বাড়ির দোরগোড়ায় পিওনকাকুর সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছি, পিওনকাকু বাবার হাতে তুলে দিলেন নীলরঙা একটা ইনল্যান্ড।

আমি অধীর আগ্রহে চিঠির অপেক্ষায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি বাবার পাশেই। বাবা কৌতূহলভরে চিঠিটা খুললেন। তারপরই হো হো করে হেসে উঠলেন। মাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো, তোমার ছেলে তো লায়েক হয়ে উঠেছে দেখছি। চিঠি লিখেছে মামাকে। তবে একটা গোলমাল করে ফেলেছে ...।' আবার হাসতে লাগলেন বাবা।

উৎকণ্ঠিত মায়ের প্রশ্ন, 'কী করেছে ও?'

— কিছু না, নিজের ঠিকানার জায়গায় মামার ঠিকানা লিখেছে, আর মামার জায়গায় নিজের ঠিকানা ... হাঃ, হাঃ, হাঃ!' হেসেই চলেছেন বাবা।

আমার লেখা প্রথম চিঠি ফিরে এসেছে আমার কাছেই।

কবিতা

বিষণ্ণতার ভিতর আমি আলো দেখতে পাই

অহর্নিশি

অমিতকুমার বর্মন

পবনপুত্রের মতো বুক চিরে
আর কতবার নিজেকে বলব
নিজেকে খুব ভালোবাসি
তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে
রক্তবীজের মতো তিলে তিলে বেড়ে ওঠে
একটা জন্মের একটা অস্তিত্বের
সহস্র বীজ
বাস্তবের ভিটেতে তোমাকে
রোপণ করতে গিয়ে
সাফল্য ধরে রাখার মতো
নিজেকে ধরে রাখার
লক্ষ্মণরেখা আগলে রেখেছি
বয়ঃসন্ধি পিষে মারতে গিয়ে
পবনপুত্রের মতো বুক চিরে
আর কতবার নিজেকে বলব
তোমাকে খুব ভালোবাসি
নিজেকে ভালোবাসতে গিয়ে।

বিষণ্ণতার কাছে

সুবল বণিক

বিষণ্ণতার ভিতর আমি আলো দেখতে পাই
বিষণ্ণতাকে ডেকে নিশিদিন
চেয়ার টেনে বসাই
আলাপ জুড়ে দিই
ভবিষ্যতের কথা জানাই
বিষণ্ণতা আমাকে বলে, মাঝে মাঝে নীরবও থাকে
আলাপ করতে করতে কখনও সন্ধে নেমে আসে
দেখি বিষণ্ণতার শরীর জুড়ে
কী যেন ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরময়
আমি অবাক হয়ে দেখি
বিষণ্ণতার ভিতর কবে থেকেই
রয়ে গেছে আমৃত্যু জীবন...

ভাসছি অন্তহীন

বেলা দে

নিরাপদ রোদ্দুরে
অনার্দ্র বাস্তব ছিল
ভুলেও ভাবিনি
সূচিপত্রহীন সময়ে
আচমকা জলোচ্ছ্বাস,
মাথায় খাঁড়ার মতো ঝুলছে
একরাশ কালো মেঘ,
ভাঙতে ভাঙতেই
সাফসুতরো মেরামতি
আবার স্বচ্ছদিনের প্রত্যাশায়
চোখে সমুদ্রস্বপ্ন,
সাজানো হল অনন্ত মিলনের সাঁকো
ঘুম ভাঙার পর — গাঢ় রাত,
অস্তিত্বের চারপাশে ভীষণ অন্ধকার
জলতোড়ে ভেসে গেছে সাঁকো
সেই থেকে খড়কুটো আগলে ভাসছি
আজও ভাসছি
অন্তহীন।

বিজয়া

দেবায়ন চৌধুরী

নীড় ছোট ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়
পুজো প্যান্ডেলের উপর মেঘের গম্বুজ, স্থির
চলে যাওয়া অমোঘ, প্রতীক্ষা অধীর
আমাদের খাওয়ার কোনও গন্তব্য নেই।
উৎসবমুখর ...
প্রতি দশমীর নামে আমি কাঠামোর বুকে
মাটি দিই। যদি কোনওদিন চোখ ফুটে যায়, তবে ...
ভারী বৃষ্টি হবে!

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক